ISSN : 3006-449X
INTERNATIONAL JOURNAL OF DIVERSE DISCOURSES

Published by: Centre for Academic Research and Development

An Open Access, Widely Indexed, Peer Reviewed Referred Journal
Vol. 1 No. 3, September, 2024

হুমায়ুন আজাদের প্রবন্ধে বিষয়স্বাতন্ত্র্য

সামিয়া ইয়াসমীন*
এম. ফিল গবেষক, বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ।
Corresponding Author: * Email: ma.samad@history.jnu.ac.bd

ARTICLEINFO

Keywords: হুমায়ুন আজাদ, রাষ্ট্র ও সমাজ, বাঙালি নারী, প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী, পুরুষতন্ত্র, সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ।

Received : 10 May, 2024
Revised : 4 September, 2024
Accepted: 10 SEP, 2024

©2023 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.

ABSTRACT

The present article analyses the uniqueness of the content of the very prominent, prolific and unconventional writer- Humayun Azad's essays. The essayists of pre- and post-independent Bangladesh were mainly concerned with their contemporary society's anxiety, pain, spirit, conflict and transition. The backdrop of sense and expectation of a deep understanding of the confined life has resonated in many of them. Humayun Azad is one of the essayists of this period who has gone beyond the tradition and highlighted the various inconsistencies and the ways out of those problems. The present research also figures out the compatibility and relevance of Humayun Azad's thoughts on the state and society with the present-day reality of Bangladesh.

ষাটের দশকের লেখকেরা মূলত সমকালীন সমাজের উদ্বেগ, যন্ত্রণা, গতি, সংক্ষোভ ও উত্তরণের মন্ত্রে দীক্ষিত। অবরুদ্ধ জীবনপটভূমির প্রগাঢ় আত্মলব্ধজাত আর্তি ও প্রত্যাশা তাঁদের অনেকের কণ্ঠেই ধ্বনিত হয়েছে। এ সময়ের অন্যতম প্রাবন্ধিক হুমায়ুন আজাদ (১৯৪৭-২০০৪) প্রথাকে অতিক্রম করে সম্পূর্ণ নিজস্ব দৃষ্টিকোণ দিয়ে রাষ্ট্র ও সমাজের বিভিন্ন অসঙ্গতি তুলে ধরেছেন ও সমাজে বিদ্যমান সমস্যা, সংস্কার থেকে উত্তরণের উপায় নির্ণয় করেছেন, যা সমকালে তাকে স্বতন্ত্র করেছে। যুগের প্রেক্ষাপটে তাঁর প্রবন্ধের বিষয় কতটা স্বতন্ত্র, যুক্তিযুক্ত ও প্রাসঙ্গিক তা অনুসন্ধান করা হয়েছে বক্ষ্যমান নিবন্ধে।

প্রবন্ধসাহিত্যের উদ্ভব-বিকাশ ও বিস্তার সামাজিক প্রয়োজন, ব্যক্তির অভিচিন্তন–প্রতিচিন্তন এবং মনন-অন্বেষার প্রক্রিয়াকে ভাষারূপ দিতে। ফলে উপনিবেশোত্তর বাংলাদেশের নতুন মানচিত্র ও ঐতিহ্যিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনসহ বাঙালির আত্মপরিচয় অন্বেষণ, রাজনৈতিক মুক্তি এবং জাতিসত্তা সন্ধানের ভাষারূপ হয়ে ওঠে বাংলাদেশের প্রবন্ধ সাহিত্য। তাই ১৯৪৭-পরবর্তীকালের বাংলাদেশের প্রবন্ধসাহিত্য দ্রুত পরিবর্তনশীল জাতীয় রাজনীতির পটপরিবর্তনের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত। জাতীয় আন্দোলন তখন প্রভাবিত করেছে প্রায় সকল সৃজনকলাকে। জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের উদ্দীপনা ও প্রতিক্রিয়ায় সৃজনশীল মানুষের চিন্তাজগতে যে বিলোড়ন ঘটেছে তা ছিল অভূতপূর্ব। মুসলিম সাহিত্য সমাজের চিন্তাসূত্রে উপনিবেশোত্তর বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী সমাজের মানসভূমি যেভাবে কম্পিত হয়েছিল তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়েছিল বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে। হুমায়ুন আজাদ ষাটের দশকে সাহিত্যজগতে প্রবেশ করলেও তাঁর প্রবন্ধ রচনা ও প্রাবন্ধিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটে স্বাধীনতা-উত্তরকালে।

হুমায়ুন আজাদের সাহিত্যজীবন শুরু হয় শিল্প-সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ রচনার মাধ্যমে। কবি ও কবিতা, কবিতার ভবিষ্যত, আধুনিকতাবাদ, সমকালীন সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়কে নিয়ে তিনি প্রবন্ধ রচনা করেছেন। প্রবন্ধ রচনার শুরুতেই তিনি বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) ও সুধীন্দ্রনাথ দত্তের (১৯০১-১৯৬০) গদ্যরীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। মূলত তিনি বুদ্ধদেব বসুর যতিচিহ্ন ও সুধীন্দ্রনাথ দত্তের শুদ্ধ ভাষা ব্যবহারের প্রতি আগ্রহী হয়েছিলেন। স্বাধীনতা-উত্তরকালে তাঁর লেখনীতে সমকাল তথা রাজনৈতিক অস্থিরতা, মধ্যবিত্ত সংকট, জাতীয়তাবাদ, নারীবাদ, মৌলবাদ, বাঙালির সমালোচনা, ইতিহাস ও ঐতিহ্য, মার্কসীয় মনোভাবের প্রতিফলন ছিল। এ সময়ে তাঁর ভাষারীতি চিন্তার স্বকীয়তার মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়েছে।

সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্য সমালোচনা, মুক্তিযুদ্ধ, ভাষা-আন্দোলন, ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতি, ধর্ম, নারী, বিজ্ঞান, কিশোর সাহিত্য, আত্মকথা প্রভৃতি বিচিত্র বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ রচনা করেছেন হুমায়ুন আজাদ। আলোচ্য নিবন্ধটি পাঠ-বিশ্লেষণ পদ্ধতি ও বর্ণনামূলক পদ্ধতির সমন্বয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

হুমায়ুন আজাদের প্রবন্ধের বিষয় যেমন স্বাতন্ত্র্যের স্মারক, তেমনি রচনারীতিতেও রয়েছে নিজস্ব ভঙ্গিমা। মানবিক মূল্যবোধের দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ শক্তি দিয়ে সমাজের অসঙ্গতিকে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বরে উচ্চারণ করেছেন ও গদ্যরীতির ব্যতিক্রমী ছন্দময়তা যা তাকে সমকালের অন্য প্রাবন্ধিক থেকে স্বতন্ত্র করেছে।

২.

ষাটের দশকের লেখক হুমায়ুন আজাদের প্রবন্ধে সমকালীন সমাজব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে তিনি নির্মোহভাবে ইতিহাসবিদদের মতো সমাজব্যবস্থার রূপ বর্ণনা করেননি। তিনি প্রচলিত সমাজকাঠামোর সমালোচনা করে প্রত্যাশিত সমাজব্যবস্থার কথা আলোকপাত করেছেন। কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য না হলেও তিনি প্রতিটি রাজনৈতিক ঘটনা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন। রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে তাঁর কাছে সমাজতন্ত্রকে সর্বোত্তম মনে হলেও তিনি একই সাথে সমাজতন্ত্রের সমালোচক ছিলেন। আবার সমাজতন্ত্রকে সমালোচনা করলেও শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার পক্ষে ছিলেন। তিনি প্রত্যাশিত রাষ্ট্রকাঠামো সম্পর্কে *একুশ আমাদের অঘোষিত স্বাধীনতা দিবস* গ্রন্থে বলেছেন–

> আমি যে রাষ্ট্রের কথা ভাবি, কাঠামোগত দিক থেকে সেটা উদার ও গণতান্ত্রিক। সেখানে যে-অর্থব্যবস্থা থাকবে তা শোষণমূলক হবে না। চেতনায় সে-সমাজ হবে শিল্পকলা ও বিজ্ঞানমনস্ক। সেখানে পৌরাণিক বিশ্বাস প্রাধান্য পাবে না। এমন সমাজ এখন পৃথিবীতে নেই। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, কানাডায় কিছুটা আভাস দেখা যায়। এই রাষ্ট্রগুলো গণতান্ত্রিক। আমাদের দেশের মত অগণতান্ত্রিক নয়। সেখানে প্রতিটি মানুষের অধিকার রয়েছে। ওই রাষ্ট্রগুলোর প্রধান ইচ্ছা করলেই কোনো সাধারণ মানুষের প্রতি অবিচার করতে পারে না। যেমন-যুক্তরাষ্ট্রের বুশ অন্যদেশ দখল করতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রীয় অর্থকোষ থেকে একটি অর্থও নিতে পারে না। আমাদের এখানে সবাই স্বৈরাচারী। আমার কাঙ্ক্ষিত রাষ্ট্রে কেউ সর্বশক্তিমান হবে না (আজাদ, ২০০৬, পৃ. ১১৬)।

বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলগুলো অধিকার রক্ষার চেয়ে নিজের স্বার্থ উদ্ধারেই বেশি ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়। তিনি রাষ্ট্রকাঠামো কেমন হওয়া উচিত সে প্রসঙ্গে বলেন,

> আমি একনেতা চাই না; চাই যারা সরকার গঠন করবে, তারা হবে সৎ, গণতান্ত্রিক, আধুনিক ও ভবিষ্যৎমুখি। সততা-সব দিকে, টাকা আর ক্ষমতা প্রয়োগ, সব দিকে। তাদের জাতির কাছে জবাবদিহি করতে হবে; আর্থিক দুর্নীতির জন্য অবিলম্বে শাস্তি পেতে হবে।... বরং আমরা মৌলবাদ প্রতিষ্ঠা করেছি, দেশকে ষষ্ঠ শতকে নিয়ে যাচ্ছি। এতো বড়ো একটা 'চ্যালেঞ্জ –এর কথা না ভেবে আমাদের কর্তব্য সৎশাসন প্রতিষ্ঠা করা, রাজনীতিবিদ ও আমলাদের ঘুষবৃত্তি বন্ধ করা, দেশকে গুন্ডামুক্ত করা, ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠা করা। চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করবে পশ্চিম, আমরা যদি সেখান থেকে সামান্যও নিতে পারি, তাই হবে যথেষ্ট।... আমাদের এখানে কেউ নিজের কাজ করছি না-বিজ্ঞানী বিজ্ঞানচর্চা করছেন না, অধ্যাপক জ্ঞানচর্চা করছেন না, সবাই রাজনীতি করছেন; সুবিধা পাওয়ার জন্যে (আজাদ, ২০১৪, পৃ. ২৫২)।

তিনি আরও মনে করতেন, এদেশের পেশিশক্তি নির্ভর রাজনীতিতে সত্যিকার অর্থে জনগণের পক্ষে কথা বলে, এমন রাজনৈতিক দল কমই আছে। অথচ বিদেশে এর ভিন্ন প্রেক্ষাপট পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেন, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী খেলার শেষে (ঘটনাটি সরাসরি দেখানো হচ্ছিলো টেলিভিশনে) ইংল্যান্ড দলের ব্যবস্থাপককে একটি পরামর্শ দেন। তার উত্তরে ব্যবস্থাপক বলেন, মিস্টার প্রধানমন্ত্রী, আপনি ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটে গিয়ে আপনার নিজের কাজ করুন। কথাটি শুনে ভয় পেয়ে হুমায়ুন আজাদের ইয়োগোশ্লাভ বন্ধুটি চেয়ার থেকে প্রায় মেঝেতে পড়ে যায়, আর বলতে থাকে, আমার দেশে একথা একটা ছোট নেতাকে বললেও ব্যবস্থাপকটিকে আর খুঁজে পাওয়া যেত না (আজাদ, ২০০৮, পৃ. ৫৮৯)।

তিনি রাষ্ট্রের সকল পর্যায়ে মৌলবাদ ও জঙ্গি তৎপরতারমুক্ত রাখার কথা বলেছেন। *আমরা কি এই বাঙলাদেশ চেয়েছিলাম*, *আমার নতুন জন্ম*, *মাতাল তরণী*, *নরকে অনন্ত ঋতু* প্রভৃতি প্রবন্ধ গ্রন্থে মৌলবাদের ভয়াবহ রূপ বর্ণিত হয়েছে। আর মৌলবাদের প্রধান শিকার নারী বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে তার ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। ধর্ম প্রধান দেশগুলো কিভাবে মৌলবাদ লালন করে আর অন্য দেশে এর প্রভাব বিস্তারে সাহায্য করে সেগুলোর বর্ণনার পাশে মৌলবাদ কিভাবে সমাজকে কলুষিত করে এবং সমাজের উন্নয়নের পথ রুদ্ধ করে সেগুলোর চিত্র অঙ্কন করেছেন। হুমায়ুন আজাদ মৌলবাদ প্রভাবিত সমাজের বিপক্ষে অবস্থান করেছেন পাশাপাশি বিজ্ঞান নির্ভর সমাজব্যবস্থা প্রত্যাশা করেছেন। ১৯৯৬ সালে বিজ্ঞান পরিষদের লেখায় বলেন–

> বাঙলাদেশ এখন ফতোয়ায় ভ'রে গেছে। যার মাথার একটা টুপি আছে, সে-ই একটা ক'রে ফতোয়া দেয়। আর এই ফতোয়াবাজরা যতই নামাজ পড়ুক না কেনো, তারা মসজিদে ব'সে শয়তানি ক'রে চলেছে, রাজনীতি ক'রে চলেছে। অর্থাৎ তারা ক্ষমতা চায়, রাষ্ট্র দখল করতে চায়। তাই এদের, পৃথিবীর সবচেয়ে ঘৃণিত ও নিষ্ঠুর ভাবাদর্শ মৌলবাদের, উদ্ধত ফণা কচলে দেয়ার জন্যে বিজ্ঞানচেতনায় জারিত প্রতিটি নাগরিককে তৎপর হ'তে হবে (আলী, ২০১৮, পৃ. ১৭৪)।

মৌলবাদ কখনও রাষ্ট্র পরিচালনার ভিত্তি হতে পারে না। বিজ্ঞান নির্ভর প্রগতিশীল সমাজব্যবস্থাই পারে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। স্বৈরাচার ও সামরিক সরকার বিরোধী আন্দোলনের পক্ষে ছিলেন। স্বৈরাচার ও সামরিক শাসনের নগ্ন রূপ উন্মোচিত হয়েছে *প্রতিক্রিয়াশীলতার দীর্ঘ ছায়ার নিচে*, *মাতাল তরণী*, *নিবিড় নীলিমা*, *নরকে অনন্ত ঋতু* প্রভৃতি গ্রন্থে। যুদ্ধাপরাধী ও মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিচারের ব্যাপারেও তিনি আজীবন সোচ্চার ছিলেন। *আমরা কি এই বাঙলাদেশ চেয়েছিলাম*, *একুশ আমার অঘোষিত স্বাধীনতা দিবস* প্রভৃতি গ্রন্থে যুদ্ধাপরাধী ও মানবতাবিরোধী অপরাধীদের জীবনচিত্র বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ফলে জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে গণআদালত গঠিত হলে তিনি বলেন–"এটা এক শুভ ও বিলম্বিত উদ্যোগ, এতে সফল হ'তে হবে, ব্যর্থতার ঝুঁকি নেওয়া চলবে না (আজাদ, ২০০৬, পৃ. ১৪)।" হুমায়ুন আজাদ তাঁর

প্রতিক্রিয়াশীলতার দীর্ঘ ছায়ার নিচে, *মাতাল তরণী*, *নিবিড় নীলিমা*, *নরকে অনন্ত ঋতু*, *আমরা কি এই বাঙলাদেশ চেয়েছিলাম* প্রভৃতি গ্রন্থে এদেশের গণতন্ত্রের শোচনীয় রূপ বর্ণনা করেছেন। প্রসঙ্গত প্রণিধানযোগ্য–

> গণতন্ত্রের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে যে-কোনো পীড়নের কবল থেকে ব্যক্তিকে রক্ষা করা। আমাদের দেশে ব্যক্তির কোনো মূল্য নেই, তাই ব্যক্তিই সবচেয়ে মূল্যবান কথাটি অনেকের কাছে ভীতিকর মনে হ'তে পারে; কিন্তু গণতন্ত্রের শুরু এ দিয়ে।... এখানে ক্ষমতা যে-রূপ সবাই উপভোগ করে, তা গণতন্ত্রের পক্ষে নয়; তা স্বৈরাচারেরই পক্ষে।" (আজাদ, ২০০৬, পৃ. ৭৩) গণতন্ত্রের কোনো ভিত্তি এদেশে পরিলক্ষিত হয় না। দল পরিবর্তন, নীতি নৈতিকতাহীন রাজনীতি এদেশের গণতন্ত্রকে কলুষিত করেছে। তাই তিনি মনে করেন, বাংলাদেশের গণতন্ত্র এখনো প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করতে পারেনি। তিনি বরং সমাজতন্ত্রের পুনরাবির্ভাবের ব্যাপারেও আশাবাদী ছিলেন (আজাদ, ২০০৩, পৃ. ২৪)।

আমলা নির্ভর শাসন ব্যবস্থার সমালোচনা করেছেন হুমায়ুন আজাদ। আমলাদেরকে এদেশে পদাধিকার বলেই প্রতিভাবান মনে করা হয়। ক্ষমতাকে বাংলাদেশে বড় প্রতিভা হিসেবে গণ্য করা হয়। তিনি বলেছেন, ক্ষমতার অপব্যবহারে তারা দস্যু, দুর্নীতিতে অদ্বিতীয়, নারী সৌন্দর্যেও তারা প্রবল উপাসক, এমনকি শিল্প সাহিত্যের এলাকায়ও তারা অপ্রতিহত । এদেশ মূলত রাজনীতিকতন্ত্র, আমলাতন্ত্র ও সেনাতন্ত্র এই তিনটি তন্ত্র দ্বারা প্রভাবিত। দেশ চালানোর জন্য আমলা দরকার, তবে আমলাতন্ত্র নিষ্প্রয়োজনীয়, বরং তা ক্ষতিকর (আজাদ, ২০০৬, পৃ. ২৬)।

হুমায়ুন আজাদ প্রত্যক্ষভাবে কোনো তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না। প্রায়োগিক দিক থেকে, মার্কসবাদ হচ্ছে মালিক তথা বুর্জোয়া শ্রেণির শোষণ, নির্যাতন, নিপীড়ন তথা মজুরি-দাসত্ব থেকে প্রলেতারিয়েতের মুক্তির মতবাদ বা দর্শন। হুমায়ুন আজাদও সমাজপতিদের দাসত্ব থেকে মুক্তি প্রত্যাশা করেছেন আবার সমাজে সবার সমান অংশগ্রহণ কামনা করেন। সাম্যবাদে যেমন সবকিছু রাষ্ট্রের মালিকানাধীন ও নিয়ন্ত্রণাধীন কিন্তু সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্র ও ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত হলেও সম্পদ ও উৎপাদনের উপকরণের উপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা থাকে বলে সুষম বন্টন নিশ্চিত হয়। প্রবন্ধে তিনি সরাসরি বলেছেন, তিনি সমাজতন্ত্র কামনা করেন (আজাদ, ২০০৩, পৃ. ২৪)। তিনি শোষণ-বঞ্চনাহীন যে সমাজ আকাঙ্ক্ষা করেন তা অনেকটা মার্কসবাদী ঘেঁষা। সাহিত্যিক হয়েও তিনি সমাজকাঠামোকে জনবান্ধব করার জন্য তিনি বিভিন্ন পরামর্শ দিয়েছেন এবং প্রচলিত সমাজকাঠামোর নগ্ন রূপ উন্মোচন করেছেন। মূলত সমাজব্যবস্থার কদর্য রূপ উপস্থাপনের পাশাপাশি তিনি কেমন রাষ্ট্র ও সমাজকাঠামো প্রত্যাশা করেন তার ইঙ্গিত দিয়েছেন রাজনৈতিক বিভিন্ন প্রবন্ধে যা আধুনিক যুগেও প্রাসঙ্গিক ও বিষয় হিসেবেও স্বতন্ত্রতার স্বাক্ষর বহন করে।

৩.

জন্মলগ্ন থেকেই লৈঙ্গিক সূত্রে নারীরা প্রতিনিয়ত বৈষম্যের শিকার হয়েছে। কাল পরিক্রমায় সে অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হলেও নারীকে অবদমনের প্রক্রিয়া সমাজে এখনও বিদ্যমান। শারীরিক ও মানসিক উভয়ভাবেই নারী বিভিন্ন হেনস্থার শিকার হয়। হুমায়ুন আজাদ তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে নারীদের প্রতি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিভিন্ন শোষণ ও নির্যাতনের বিবরণ দিয়েছেন পাশাপাশি নারীদের নিজস্ব সত্তা ও স্বাধীনভাবে আত্মপ্রকাশের বিভিন্ন উপায় বর্ণনা করেছেন। হুমায়ুন আজাদের নারীভাবনা বিষয় হিসেবে যুগের প্রেক্ষাপটে কতটা যৌক্তিক ও প্রাসঙ্গিক তা আলোচনা করার প্রয়াস পাব।

নারীবাদ হুমায়ুন আজাদের চিন্তা-ভাবনার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটিয়েছে। মূলত ইউরোপে তিনি নারীবাদ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারেন । প্রসঙ্গত তিনি বলেন,

> ... নারীবাদী বইপত্র পড়ার পর চিন্তাভাবনার পরিবর্তন খুব ভালোভাবে ঘটেছে। আমি দেখেছি যে গত চল্লিশ বছরে বিচিত্র ধরনের চিন্তার মধ্যে নারীবাদী চিন্তার মতো বিপ্লবাত্মক চিন্তা আর নেই। তারা এ-সমাজব্যবস্থাকে বদলে দিয়েছে (আজাদ, ২০১৪, পৃ. ২১৩)।

তবে দুঃখের বিষয় নারীবাদী আন্দোলনের সুফল এদেশের নারীরা ভোগ করতে পারেনি। তিনি বলেন,

> আমাদের দেশে কোনো সুফলই আসেনি, তার কারণ রাষ্ট্র দখল ক'রে থাকে অন্ধ, দুষ্ট, অসৎ, ভন্ড, মূর্খ ও চোরেরা। গণতন্ত্রের সুফল কি আমরা পেয়েছি, স্বাধীনতার সুফল? তাই নারীবাদী আন্দোলনের সুফল আসবে কীভাবে? আর এখানে ঠিক নারীবাদী আন্দোলন হয়নি, হয়েছে প্রথাগত নারীমুক্তি আন্দোলন, যার লক্ষ্য পুরুষদের কাছে থেকে অল্পস্বল্প সুবিধা আদায় করা, পুরুষের পৃষ্ঠপোষকতায় একটু সুবিধা ও ক্ষমতা ভোগ করা (আজাদ, ২০১৪, পৃ. ২১৩)।

হুমায়ুন আজাদের প্রবন্ধগুলোর একটি বিরাট অংশ জুড়ে আছে নারী। নারীর বুদ্ধিবৃত্তিক অগ্রগতি ব্যতীত একটি রাষ্ট্র ও সমাজ কখনো উন্নতি সাধন করতে পারে না। প্রতিটি পদক্ষেপে নারীরা শুধু দৈহিকভাবে নয়, সামাজিকভাবেও ধর্ষিত হয়। পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে নারীকে গৃহে আবদ্ধ করার যে প্রচেষ্টা তাকে তিনি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছেন। নারী শুধু গৃহের কাজ করে পরিবারের সদস্যদের সেবা করার জন্য জন্মায়নি। তিনি এই প্রসঙ্গে বিদ্রূপ করে বলেছেন – 'নারী শুধু মাতৃত্বের যন্ত্রণা ভোগ করবে, তবে পুরুষ চায় শয্যায় তার স্ত্রীটি হবে সমস্ত যৌনবেদনময়ী অভিনেত্রীর সমষ্টি; তারা নারীকে চায় সব সময় সতী, কিন্তু শয্যায় বারাঙ্গনা' (আজাদ, ২০১৪, পৃ. ২১৩)। তবে আধুনিক যুগে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের প্রচলিত ধারণার পরিবর্তন সম্পর্কে তাঁর উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য – "একজন স্বামী এবং স্ত্রী একত্রে থাকে ব'লে তার মানে নয় যে আমরা সমস্ত কিছুতেই অন্যের ওপর আধিপত্য করবো। বিয়ের আদিম রূপটি হচ্ছে অধিকার। স্বামী প্রভু এবং স্ত্রী দাসী । কিন্তু আধুনিক ব্যবস্থায় স্বামী-স্ত্রী কেউ কারো প্রভু বা দাসী নয়" (আজাদ, ২০১৪, পৃ. ২৬৬)। বিয়ের মতো পবিত্র সম্পর্কের ক্ষেত্রেও নারীদের প্রতিনিয়ত লৈঙ্গিক বিভাজনের শিকার হতে হয়। নারীদের প্রাপ্য সম্মান দেনমোহর পেতে রীতিমত যুদ্ধ করতে হয়। নারী অবদমনের বিভিন্ন বিষয় চিন্তা করে তিনি নর-

নারীর সর্ম্পকে বিয়েকে উপেক্ষা করে প্রকারান্তরে পৃথিবীর প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান পরিবারকে অস্বীকার করেছেন। তিনি মনের মিলনই মুখ্য বিবেচনা করেন। সমাজে প্রচলিত বিবাহপ্রথা সম্পর্কে তিনি বলেন,

> যে-বিবাহপ্রথা কয়েক হাজার বছর ধ'রে চ'লে আসছে, তা কিন্তু নারীপুরুষের মধ্যে কোনো গভীর মিলন ঘটাতে পারেনি। এর মধ্যে একটা বিরোধ রয়ে গেছে, এবং এটি একটি ব্যর্থ অন্তঃসারশূন্য প্রথায় পর্যবসিত হয়েছে। আমার নারী বইটিতেও বিবাহের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। সম্ভবত আগামী শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় বিবাহপ্রথা উঠে যাবে। প্রথাগত স্বামী-স্ত্রী, প্রথাগত পরিবার উঠে যাবে। ইউরোপ-আমারিকায় এখনই তো অনেকখানি উঠে গেছে (আজাদ, ২০১৪, পৃ. ১৫৬)।

বিবাহ প্রথার জন্যে নারীর প্রতি সহিংসতা, নির্যাতন ও শোষণের যে প্রক্রিয়া প্রচলিত আছে তার জন্যেই হয়ত বিবাহ প্রথা উঠে যাবে একদিন। নারীকে সংসার নামক বন্দি কারাগার থেকে মুক্ত করা যাবে। তবে এ পথ হয়ত ততোটা মসৃণ হবে না। কেননা নারীদের জন্মলগ্ন থেকেই পুরুষের আনুগত্য করার শিক্ষা দেওয়া হয়। আর এ ক্ষেত্রে রূঢ় বাস্তবতা হলো মা এই ভূমিকা রাখে। প্রসঙ্গত লেখক বলেন, "বালিকার সবচেয়ে বড় শুভার্থী তার মা; তবে মা-ই হয়ে ওঠে বালিকার বড়ো শত্রু। মা হচ্ছে পুরুষতন্ত্রে দীক্ষিত প্রাণী, যে নিজের জীবন দিয়ে সেবা করে পুরুষতন্ত্রের। মা মেয়েকে নিজের থেকেও নারী ক'রে তুলতে চায়, আর ছেলের মধ্যে চায় চূড়ান্ত পৌরুষ" (আজাদ, ২০১৪, পৃ. ১৯৪)। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে রয়েছে নারীদের অধস্তন রাখার কৌশল। নারী নির্যাতনের সবচেয়ে ভয়াবহ রূপ ধর্ষণ। প্রায় প্রতিটি সমাজেই এই ভয়াবহ ব্যাধি প্রচলিত আছে। হুমায়ুন আজাদ 'নারী' গ্রন্থের 'ধর্ষণ' প্রবন্ধে ধর্ষণের ভয়াবহ রূপ বর্ণনার পাশাপাশি ধর্ষণ প্রতিরোধের উপায় বর্ণনা করেছেন। ধর্ষণের শিকার নারীকে বিচার চাইতে হলে মোট তিনবার তার মধ্যে দুবার রূপকার্থে ধর্ষিত হতে হয়। এর মাধ্যমে বিচারব্যবস্থার বেহাল দশার বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি ধর্ষণ প্রতিরোধের জন্য নারীদের শারীরিক শক্তির বৃদ্ধির পাশাপাশি ঘরে ও বাইরে পুরুষের সমকক্ষ হওয়ার পরামর্শ দেন।

প্রগতিশীলরা অন্তর্লোকে রক্ষণশীল হওয়ায় নারীদের সামনে অগ্রসর হওয়া অনেকটা রূঢ় বাস্তবতা। মৌলবাদকে নারীর অগ্রগতির প্রধান বিঘ্ন উল্লেখ করে বলেন – "নারীর শত্রুর শেষ নেই, তবে মৌলবাদ নারীর প্রধান শত্রু। এখানে মার্ক্সবাদীরা প্রগতিশীল; কিন্তু বিস্ময়কর হচ্ছে এক ব্যাপারে তারা যেনো মিলে যায় মৌলবাদীদের সাথে। নারীব্যাপারে প্রগতিশীলেরাও হয়ে ওঠে রক্ষণশীল"(আজাদ, ১৯৯২, পৃ. ১২৩)। এমনকি মহাপুরুষরা কালে কালে নারীদের অবরুদ্ধ করে রেখেছেন সে প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "মহাপুরুষেরা যেমন কল্যাণকর, তেমনি বিপুল শেকলে বেঁধে গেছেন মানুষকে বিশেষ ক'রে নারীকে " (আজাদ, ২০১৪, পৃ. ১১৯) আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়েই নারীদের নিজেদের পথের কাঁটা দূর করে এগিয়ে যেতে হবে।

নারীরা প্রাচীনকাল থেকেই সমাজের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন- সৌদি আরবে নারী স্বাধীনতা নেই, ১৯৯১ সালে সৌদি আরব সরকার মেয়েদেরকে ঘর থেকে বের করে এনে সেবিকার দায়িত্ব দেয়, আবার যখন যুদ্ধ শেষ হয়ে যায় তখন আবার ঘরে ঠেলে দেয়। নারীদেরকে দমন ও আনুগত্যের জন্যে ধর্মগ্রন্থও ব্যবহার করা হয়েছে । বেগম রোকেয়া *স্ত্রীজাতির অবনতি* প্রবন্ধে এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করেছেন। নিজেদের অধিকার ও স্বাধীনতা সচেতন হলে নারীমুক্তি সময়ের ব্যাপার মাত্র। তবে শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকতে থাকতে নারীরাই মুক্তি প্রত্যাশা করে না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নারী বিকাশের পক্ষে ছিলেন না। বৃদ্ধ বয়সে তাঁর চিন্তা-চেতনার কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলোতে দুই ধরনের নারীচরিত্র পাওয়া যায় : এক কল্যাণী স্ত্রী, অন্য অর্থে জননী; আর উর্বশী। এ উর্বশী কারো ঘরে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালে না; কঙ্কণ বাজিয়ে কারো শয্যায় যায় না। পুরুষের চিত্তে সে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। রবীন্দ্রনাথ উর্বশীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ ছিলেন, তবে তিনি শ্রদ্ধা করতেন কল্যাণী নারীকে, যাকে তিনি ব্যর্থ নারী মনে করতেন। *ধর্মানুভূতির উপকথা ও অন্যান্য* এ গ্রন্থের *সাক্ষাৎকার* প্রবন্ধে তিনি সুস্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।

হুমায়ুন আজাদ কোন দৃষ্টিকোণ দিয়ে রবীন্দ্রনাথের নারীভাবনা বিশ্লেষণ করেছেন এর মাধ্যমে তাঁর নারীভাবনা অনুমান করা যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নারীদের ক্ষেত্রে ইউরোপীয় ভিক্টোরিয়ান তত্ত্ব বিশ্বাস করতেন। এ সম্পর্কে হুমায়ুন আজাদ বলেন,

> এ-তত্ত্ব অবশ্য রবীন্দ্রনাথের নিজের নয়-এটি ভিক্টোরীয় তত্ত্ব। এটা তারই প্রতিষ্ঠান। ভিক্টোরীয় তাত্ত্বিকেরা যখন দেখেন, নারীরা মুক্ত হ'তে চাচ্ছে, তখন তাদের নানাভাবে তোষামোদ করার প্রয়োজন দেখা দিলো। একটি আর অন্যটি থেকে উৎকৃষ্ট নয়। কাজেই পুরুষের জন্য বাইর, আর নারীর জন্য ঘর। নরনারী পরস্পরের পরিপূরক। ভাওতাটুকু বাদ দিলে দেখা যায় যে, এ-তত্ত্বে বলা হয়েছে পুরুষ কাজ করবে, জয় করবে, প্রাধান্য বিস্তার করবে, আর নারী শুধু ঘরে থাকবে, সন্তান উৎপাদন করবে, পুরুষের মনে ও শরীরে আনন্দ দেবে, সভ্যতায় তাদের কোন প্রভাব থাকবে না। রবীন্দ্রনাথ এ-ধরনের তত্ত্বে বিশ্বাস করতেন (আজাদ, ২০১৪, পৃ. ১৫৬)।

উপরিউক্ত বিশ্লেষণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নারীদের গৃহে বন্দি রাখার পক্ষে নন হুমায়ুন আজাদ। তবে জীবনের শেষ পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এ চিন্তার ব্যাপক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। নারীদের প্রতিভার বিকাশ চেয়েছেন, তাদেরকে পুরুষের সাথে তাল মিলিয়ে সভ্যতার অগ্রগতিতে অবদান রাখার প্রত্যাশা করেছেন। যাকে হুমায়ুন আজাদ ইতিবাচক পরিবর্তন মনে করে বলেন, "তবু সুখকর হচ্ছে যে পঁচাত্তর বছর বয়সে রূপান্তরিত হন রবীন্দ্রনাথ, এবং আরো সুখকর হচ্ছে যে নারীরাই রূপান্তরিত করেছিলো তাকে (আজাদ, ২০১৫, পৃ. ২৮)।" আবার সিগমুন্ড ফ্রয়েড নারীর প্রতি বিভিন্ন নির্যাতন, তাদের শারীরিক

দুর্বলতাকে মেনে নিয়ে জীবনযাপন করতে বলেছেন। ফ্রয়েড মূলত পুরুষতন্ত্রকে সমর্থন করেছেন। হুমায়ুন আজাদ ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছেন এভাবে, "ফ্রয়েড মনে করেন নারী জৈবিকভাবেই তৈরি হয়েছে পীড়ন ভোগ করার জন্যে; পীড়ন নারীর জন্যে এক ধরনের সুখ। তাই পুরুষ যখন পীড়ন করে নারীকে, তখন পুরুষ কোনো অপরাধ করে না, বরং তাকে দেয় সুখ। ফ্রয়েডীয় মর্ষকামবাদকে তার যৌক্তিক পরিণতিতে নিলে দাঁড়ায় যে পীড়নধর্ষণ নারীর জন্যে শুধু ভালোই নয়, বরং নারী ব্যাকুল হয়ে থাকে এরই জন্যে।"(আজাদ, ২০১৫, পৃ. ১৬৪)। হুমায়ুন আজাদ সমাজ ও সাহিত্যে নারীর অবস্থান বিশ্লেষণ করেছেন। যেসব সাহিত্যিক ও লেখক নারীদের অগ্রগতিতে ভূমিকা রেখেছেন তাদের যেমন প্রশংসা করেছেন পাশাপাশি যারা পুরুষতন্ত্রের পক্ষে কথা বলেছেন তাদের সমালোচনা করেছেন। আবার এদেশের নারী লেখকদের নিয়ে তিনি মতামত প্রকাশ করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য,

> বর্তমান নারী লেখকদের দুটো ভাগে ভাগ করা যায়। তার একটি হচ্ছে প্রথাগত ধারা। এ ধারার নারী লেখকরা প্রথাগতভাবে পুরুষের চিন্তাধারা অনুসারে ও অনুকরণে সাহিত্য সৃষ্টি করছে। এরা পুরুষতন্ত্রের সব বিধিবিধান মেনে চলেন এবং পুরুষতন্ত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকেন এবং নানারকম সংঘে যোগ দেন। তারা বেশ খ্যাতি অর্জন করেন। দ্বিতীয় যে ধারাটি রয়েছে সেটি পুরুষতন্ত্রের সঙ্গে সংগ্রামরত। এ ধারার নারী লেখকরা বিধিবিধান অমান্য করেন, সমাজকে অমান্য করেন, সামাজিকভাবে নিন্দিত হন।... আমরা নারী লেখকদেরকেও একধরনের যৌনসামগ্রী বলে গণ্য করছি (আজাদ, ২০০৬, পৃ. ২৩)।

নারীদের প্রতিভার মূল্যায়ন হয় না। তবে নারীদের মনোবল বাড়াতে হবে। তিনি মূলত সমাজের জন্য প্রগতিশীল নারী প্রত্যাশা করেছেন।

তিনি নারীবাদী কাঠামোতে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর অবস্থান বিশ্লেষণ করেছেন। স্পষ্টভাবে বলেছেন– "কেউ নারী হয়ে জন্মে না, ক্রমশ নারী হয়ে উঠে।"(আজাদ, ২০১৫, পৃ. ১৯) পুরুষশাসিত সমাজে নারীরা অনেকটা দাসত্বের শৃঙ্খলে বন্দী। অর্থনৈতিক মুক্তি ছাড়া এ শৃঙ্খল ভাঙা সম্ভব নয়। নারী মুক্তির পাথেয় সম্পর্কে লেখক বলেন – "নারীকে ঘৃণা করতে শিখতে হবে সম্ভোগের সামগ্রী হতে, এবং হতে হবে সক্রিয়, আক্রমণাত্মক। ভবিষ্যত সৃষ্টি করে নিতে হবে নিজেকেই, পুরুষ তার ভবিষ্যত সৃষ্টি করবে না। নারীর ভবিষ্যত মানুষ হওয়া, নারী হওয়া নারী থাকা নয়।" (আজাদ, ২০১৫, পৃ. ৩৭১)। 'নারী' গ্রন্থের 'পুরুষতন্ত্র ও রোকেয়ার নারীবাদ' প্রবন্ধে নারীদের মানসিক শক্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে নারীরা শিক্ষার মাধ্যমে নারীদের অগ্রগতি প্রত্যাশা করেছেন। নারীদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে হবে এবং শারীরিক দুর্বলতা অতিক্রম করতে হবে মানসিক শক্তির সাহায্যে।

নারীদের খাদ্য, বাসস্থান, নিরাপত্তাসহ সকল জৈবিক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করা উচিত রাষ্ট্রের । কিন্তু সমাজপতিরা নারীকে শুধু বিভিন্নভাবে ব্যবহার করতে চায় । রাষ্ট্র তথা প্রশাসনকে দায়ী করে তিনি বলেন,

> রাষ্ট্র শিক্ষিত নারীদের জীবিকার ব্যবস্থা করতে পারছে না, উচ্চশিক্ষিত নারীদের পতিতায় পরিণত করছে । এজন্য দায়ী ওই শিক্ষিত তরুণীরা নয় - দায়ী রাষ্ট্র, যে রাষ্ট্র উচ্চশিক্ষিত নারীদের জীবিকার ব্যবস্থা করতে পারে না, তাকেই বরং দণ্ডিত করা উচিত । পুলিশের কোনো কাজই ভালো নয়, পতিতা ধরাও তাদের একটি খারাপ কাজ । তারা কিন্তু নিয়মিত পতিতা উপভোগ করে, উচ্চশিক্ষত সুন্দরী পেলে তো কথাই নেই। ... উচ্চশিক্ষিত না নিলে কম বয়সে বিয়ে ক'রে তারা স্বামীর ঘরে যেতে পারত, তা যেতে পারছে না; আবার চাকুরিও পাচ্ছে না । সরকার তাদের কাজ দিতে পারছে না। অর্থসঙ্কট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে তখন কেউ কেউ হয়তো গোপন পতিতার পোশাক বেছে নেয়। ওই মেয়েদের কোনো দোষ নেই; দোষ যা – কিছু, তা রাষ্ট্রের । কারণ রাষ্ট্রই এসব যুবতীদের পতিতা বানিয়েছে।(আজাদ, ২০১৫, পৃ. ২৫৬)।

আবার কর্মজীবী তবে প্রগতিশীল নারীই তিনি পছন্দ করেন । যারা শত বিঘ্ন পেরিয়ে এগিয়ে যায় নিজস্ব গতিতে । সামাজিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ ও পুরুষশাসিত সমাজে নারীরা তেলেপোকার মতো টিকে থাকে শুধু। সমাজের রূঢ় বাস্তবতার শিকার নারীদের পক্ষে যেমন বলেছেন, তেমনিভাবে যারা সুযোগ পেয়েও অবহেলায় হারায় তাদের সমালোচনা করেছেন।

নারীরা যতক্ষণ শারীরিক শৃঙ্খলা থেকে নিজেদের মুক্ত করতে না পারছে ততক্ষণ তারা প্রতি পদক্ষেপে অবদমনের শিকার হবে। পিতৃতন্ত্রের ধারক ও বাহকরা নারীদের দেহকে তাদের নিয়তি মনে করে। আর দেহকেই ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে তাদের অগ্রগতি রুদ্ধ করতে।

নারীদের সর্বক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে হলে ঐক্যবদ্ধতার বিকল্প নেই। কিন্তু তাদের এ চলার পথ মসৃণ হবে না। এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে পিতৃতন্ত্র। নারীদের রাজনীতি সচেতন হতে হবে, নিজেদের সীমাবদ্ধতা খুঁজে বের করে সেগুলো সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। আর এক্ষেত্রে দলবদ্ধতার বিকল্প নেই। আমাদের বোধগম্য হয় তাঁর প্রবন্ধ বিশ্লেষণে যে, শিক্ষিত হয়ে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে নারীরা স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করবে এটিই হুমায়ুন আজাদ প্রত্যাশা করেছেন। তিনি নারীদের মধ্যে বুদ্ধিভিত্তিক প্রতিফলন চেয়েছিলেন। নারীকে লৈঙ্গিক বিভাজনে আবদ্ধ করতে চাননি, মানুষ হিসেবে তথা সৃষ্টির সেরা জীব মানুষরূপে তার পরিত্রাণ কামনা করেছেন। হুমায়ুন আজাদের নারীভাবনা সমকালে শুধু নয় আধুনিক যুগেও তাঁর প্রবন্ধের বিষয় স্বকীয়তাকে নির্দেশ করে।

৪.

হুমায়ুন আজাদ স্বদেশের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন। ইতিহাসের প্রতি কৌতূহলবশত, দেশি ও বিদেশীয় বিজাতীয়দের নানাবিধ অপপ্রচার ও ভ্রান্তিমূলক ইতিহাস চর্চা রোধ করার জন্যই সাহিত্যে তিনি সমকালীন সমাজকে অঙ্কন করেছেন যা তাঁর ইতিহাসচেতনার উৎসভূমি। তিনি সমকালীন সমাজের গঠনমূলক সমালোচনা করেছেন। পাশাপাশি সমস্যা সমাধানের বিভিন্ন উপায় যুক্তিতর্কের মাধ্যমে তিনি

ব্যাখ্যা করেছেন। ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ তাঁর প্রবন্ধে প্রতিফলিত হয়েছে। তবে অনেকক্ষেত্রে তিনি ইতিহাসকে পর্যবেক্ষণ করেছেন সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে।

লেখকের ইতিহাস চেতনার ভিত্তিভূমি হলো সমকাল। সমকালের সমস্যা, সীমাবদ্ধতার প্রসঙ্গ এসেছে বিভিন্ন প্রবন্ধে। লেখকের ইতিহাসচেতনা ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পাব প্রবন্ধগ্রন্থের ব্যাখ্যার আলোকে। যেমন- *ভাষা-আন্দোলন: সাহিত্যিক পটভূমি* গ্রন্থে তিনি ভাষা আন্দোলনকে পটভূমি করেননি বরং ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে সাহিত্য যে পাকিস্তানবাদী তথা প্রগতিবিরোধী আবেগ-উচ্ছ্বাস থেকে মুক্ত হতে পেরেছে সেটি তিনি বিভিন্ন আঙ্গিকে পর্যালোচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে *পাকিস্তানবাদী সাহিত্যতত্ত্ব:প্রতিক্রিয়াশীলতার বিষবৃক্ষ* প্রবন্ধে বলেছেন– "১৯৪০- এর পর থেকে বাঙালি মুসলমান লেখকেরা উদ্যোগী হয়ে ওঠেন সাম্প্রদায়িক পাকিস্তানবাদী সাহিত্যসৃষ্টিতে,যাতে শিল্পকলা ও জীবনের থেকে সাম্প্রদায়িকতার পরিমাণ অনেক বেশি।" (আজাদ, ২০১৪, পৃ. ১১)

আলোচিত প্রবন্ধেই হুমায়ুন আজাদ ভাষা আন্দোলনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের অবতারণা না করে সাহিত্যিক প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমেই বাংলা সাহিত্য পাকিস্তান প্রভাব হতে মুক্ত হতে পেরেছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য–

> সাম্প্রদায়িক সাহিত্যতত্ত্ব বেশ ক্ষতি করেছিলো বাঙালী মুসলমান সাহিত্যের: চল্লিশের দশকে সুস্থ একটি আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের ধারা তাঁরা সৃষ্টি করতে পারতেন যদি না পাকিস্তানি রাজনীতি ও পাকিস্তানবাদী সাহিত্যতত্ত্ব তাঁদের রাজনীতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতো। এ নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তির জন্য দরকার হয়েছিলো বায়ান্নোর ভাষা-আন্দোলন (আজাদ, ২০১৪, পৃ. ১২)।

পাকিস্তান ও পাকিস্তানবাদী সাহিত্যতত্ত্ব বাঙালির জীবনের দুর্ঘটনা। কবিতা, কথাসাহিত্য ও প্রবন্ধে পাকিস্তানবাদ কিভাবে প্রচারিত হয়েছে, তা সাহিত্যের মান কতটা ক্ষীণ করেছে সেগুলোর নিখুঁত চিত্র অঙ্কন করেছেন। মানুষ মাত্রই সৃজনশীল। তার বিকাশের জন্য যেমন স্বাধীনতা প্রয়োজনীয়, তেমনি সংস্কৃতির বিকাশের জন্য প্রয়োজন স্বাধীনতা। জাতীয় প্রতিভার বিকাশ সাধনের মাধ্যমে বিশ্বের সংস্কৃতির ঐতিহ্য ও ইতিহাস তুলে ধরার মাধ্যমেই সাংস্কৃতিক আগ্রাসন রোধ করা সম্ভব । তবে লেখক স্পষ্টত বলেছেন– "সৃষ্টিশীলতা ছাড়া নিজস্বতা রক্ষা করা অসম্ভব।"(আজাদ, ১৯৯২, পৃ. ২১)

সংস্কৃতিকে কোনো নিয়ন্ত্রণে না রেখে স্বাধীনভাবে বিকাশের সুযোগ দিলে সৃজনশীলতায় সেটি আপন আলোয় উদ্ভাসিত হতে পারে। মুক্তিযুদ্ধের সামগ্রিক ইতিহাস বিবেচনা করে তিনি বলেন , মুক্তিযুদ্ধের পরও কাঙ্ক্ষিত রাষ্ট্রের গুণাগুণ প্রাপ্ত হয়নি বাংলাদেশে। অন্যায়, অবিচার, শোষণ, নৈরাজ্যে পরিপূর্ণ এদেশ। যা স্বাধীনতার সকল ত্যাগ-তিতিক্ষাকে ম্লান করে দিয়েছে (আজাদ, ১৯৯২, পৃ. ৪৩)। তাই তিনি তাঁর *নির্বাচিত প্রবন্ধ* গ্রন্থেও 'নামপরিচয়হীন যে-কোনো একজন নিহত মুক্তিযোদ্ধার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা' প্রবন্ধে ক্ষমা চেয়েছেন। তিনি এ প্রবন্ধে বলেছেন- "আমি তোমার কাছে, আমার একমাত্র বীর, দিনরাত ক্ষমাপ্রার্থনা করি।" (আজাদ, ২০১৪, পৃ. ১৫৩)

তিনি ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করেছেন নির্মোহভাবে ও যুক্তিসংগতভাবে। অর্থাৎ সমকালীন সমাজপতিদের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে এবং দেশের ইতিহাসকে বিকৃতি থেকে মুক্ত করতে সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেই ইতিহাস লিখেছেন। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকান্ডের বর্ণনা পড়ে প্রতিক্রিয়া জানান এভাবে–

> ম্যাসক্যারেনহ্যাস তাঁর বাঙলাদেশ : এ লেগ্যাসি অফ ব্লাড বইতে তাদের পরিকল্পনার যে-বিবরণ দিয়েছেন, তা প'ড়ে শিউরে উঠতে হয়; বোঝা যায় এক ধরনের মত্ততা পেয়ে বসেছিলো তাদের, কিন্তু মাথা ঠান্ডা রেখে তারা এগিয়েছে তাদের হিংস্রতার দিকে। তারা শুধু একা মুজিবকে হত্যা করে নি, তারা চেয়েছিলো মুজিবের রক্তের সমস্ত ধারা নিঃশেষ ক'রে দিতে। তাঁর পরিবারের কাউকে বাঁচতে দেয়া হয়নি; নগরের বিভিন্ন প্রান্তে হানা দিয়ে হত্যা করেছে তাঁর আত্মীয়দের। খুনে তারা যে- দক্ষতা দেখিয়েছে, তার বীভৎসতা তুলনাহীন।" (আজাদ, ২০০৮, পৃ. ৬১৫)

সমকালীন সমাজকে সাহিত্যের অবয়বে ধারণ করেছেন তিনি। ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনাকে সংযুক্ত করে সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণ দিয়ে সমাজ ও সাহিত্যের নানা অসঙ্গতি বিদ্রূপাত্মকরূপে তুলে ধরেছেন। তিনি ক্ষেত্রবিশেষে সমাধানের বিভিন্ন উপায়কে যুক্তিসঙ্গতভাবে উপস্থাপন করেছেন, আবার অনেক ক্ষেত্রে ক্ষমা প্রার্থনা করে আত্ম হৃদয়ের আর্তনাদ প্রকাশ করেছেন। তিনি ইতিহাস ও সাহিত্যের বিভিন্ন অসঙ্গতি নির্দেশ করেছেন ও তা থেকে উত্তরণের উপায় বর্ণনা করেছেন যা তাঁর বিষয়ভাবনার উপকরণকে প্রাসঙ্গিক ও স্বতন্ত্র করেছে।

৫.

বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মান ক্রমান্বয়ে নিম্নতর হচ্ছে। পরীক্ষার খাতায় তার নমুনা পাওয়া যায়। এমনকি যে ভাষার জন্য বাঙালি প্রাণ দিয়েছে, সেই ভাষার বিকৃত ব্যবহার সত্যিই দুঃখজনক। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য," পরীক্ষার খাতায় পাওয়া যায় বাঙালির মগজের মর্মস্পর্শী প্রকাশ। বানান ভুলের কোনো শেষ নেই, বক্তব্যেও কোনো ব্যাকরণ নেই, বাক্যের কোনো রূপ নেই- এ হচ্ছে পরীক্ষার খাতা; অধিকাংশ খাতা। পরীক্ষার খাতা দেখা হচ্ছে চিন্তার নর্দমায় সাঁতার কাটা বক্তব্যেকে কতোটা অসম্ভব বিকৃত এবং ভাষাকে কতোটা নিরর্থক করা যায়, তা দেখতে হলে পরীক্ষার খাতার কাছে আসতে হবে।" (আজাদ, ২০০৮, পৃ. ৫১৪) শিক্ষাপদ্ধতির বিভিন্ন ত্রুটি নিয়ে সমালোচনা করে বলেছেন," কোর্সপদ্ধতির কুফলের উল্টো পিঠ তার সুফল : এ পদ্ধতিতে খারাপ ছাত্রদের পক্ষেও প্রথম শ্রেণী পাওয়া সম্ভব; এবং এখন পাচ্ছে। ... এ নীতিতে নম্বর বাড়ে, ফল ভালো হয়, প্রথম শ্রেণী পায়; কিন্তু পড়াশুনোটি প্রথম শ্রেণীর মানের নয়। ... কোর্সপদ্ধতি আমাদের উপযোগী নয়, এ- পদ্ধতি আমাদের জ্ঞানকে রুগ্ন থেকে রুগ্নতর ক'রে তুলছে । এ- রোগের আশুচিকিৎসা ছাড়া আমাদের বিদ্যার ভবিষ্যৎ খুবই খারাপ।(আজাদ, ২০০৮, পৃ. ৫১৯-২০) শিক্ষার প্রতিটি স্তরে দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি বলেন, "বোর্ডকে মুক্তি পাওয়া দরকার তার বাস্তুঘুঘুদের কবল থেকে। বোর্ড এখন হয়ে উঠেছে শিক্ষাবিস্তারের নামে শিক্ষাদূষণ প্রতিষ্ঠান। জাতির

মঙ্গলের জন্যেই বোর্ডের শুদ্ধিকরণ দরকার; এবং বোর্ডের আবর্জনার হাত থেকে বাঁচানো দরকার বাঙলার ছাত্রছাত্রীদের।"(আজাদ, ২০১৪, পৃ. ১৪০)

শিক্ষার মান নিম্নতর হলে কোনো দেশ উন্নতি করতে পারে না, তেমনিভাবে নাগরিকের জীবনযাত্রার মান ক্রমশ নিম্নগামী হয়। প্রত্যেক দেশে শিক্ষকদের সবচেয়ে অধিক মর্যাদা দেওয়া হয়, আর এদেশে কোণঠাসা করে রাখা হয়। শিক্ষকরা দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থান করলে সমাজপতিরা স্বস্তি পায়। ফলে মানুষের অন্য কোনো গতি না থাকলে অথবা স্বেচ্ছায় এই পেশায় আসে না।

হুমায়ুন আজাদ বলেন," বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটো কাজ, – একটি জ্ঞান বিতরণ করা, অপরটি জ্ঞান সৃষ্টি করা।"(আজাদ, ২০১৪, পৃ. ১৬৮) অথচ বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞানচর্চার পরিবর্তে রাজনীতির চর্চা মুখ্য হয়ে উঠেছে। পদ - পদবি, অর্থ, ক্ষমতার মোহে অন্ধ হয়ে উঠেছে ছাত্ররাজনীতি, কোনো কিছু আদায়ে তথা দেশের আপামর জণগনের জন্য ছাত্ররাজনীতির প্রতিবাদ, সভা, মিছিল আর পরিলক্ষিত হয় না।

বায়ান্নোর ভাষা-আন্দোলন, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান সর্বোপরি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ ছাত্ররাজনীতির যে সুফল ভোগ করেছে এবং কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করেছিল, সেই হারানো গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলো এখন অতীত হয়ে উঠেছে। স্মৃতির পাতায় অম্লান হয়ে আছে। বিশ্ববিদ্যালয়সহ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে জ্ঞানের প্রবাহ না থাকলে আদৌতেও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন আছে কিনা সমাজনির্ধারকদের তা ভেবে দেখা উচিত অথবা জ্ঞানের পরিবেশ সৃষ্টি করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। বিখ্যাত হওয়ার জন্য মানুষ প্রতিনিয়ত তার ব্যক্তিত্ববোধ, সততা ও নিষ্ঠাকে বিকিয়ে দিচ্ছে। জ্ঞানী হওয়ার চেয়ে বিখ্যাত হওয়ার প্রবণতা বেশি।

সমাজপতিদের আকাঙ্ক্ষার সাথে তাল মিলিয়ে চলছে সবাই। কপটতার আশ্রয় নিয়ে চারিদিকে অসুস্থ প্রতিযোগিতা চলছে । এগুলো থেকে পরিত্রাণের জন্য মুক্তবুদ্ধি চর্চার পাশাপাশি বিভিন্ন গঠনমূলক পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। তা না হলে জাতির পচন রোধ করা সম্ভব হবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা নিয়েও হুমায়ুন আজাদ কটাক্ষ করেছেন। তিনি মনে করেন, রাষ্ট্রযন্ত্রের চোখে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল হয়তো উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, প্রতিবাদ, রাজনীতি প্রভৃতি, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল অর্থ যে জ্ঞান, এটা সেই যন্ত্র বোঝে না। পদের মোহ না কাটলে জ্ঞানচর্চা সম্ভব না। উপাচার্যদের বুঝতে হবে বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞানকেন্দ্র, শক্তিকেন্দ্র নয়। প্রসঙ্গত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সম্পর্কে তিনি 'উপাচার্যগণ, তাঁদের সংস্কৃতি ও পরিণতি'-প্রবন্ধে বলেছেন,"বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি পণ্ডিত উপাচার্য কামনা করি, যিনি অফিসেও বই পড়বেন, ক্লাশও নেবেন,ক্ষমতায় থাকার সময়ও গবেষণা করবেন।" (আজাদ, ২০১৪, পৃ. ৫০৭)

উপাচার্যরা পদের মোহ যদি ভুলতে পারেন, জ্ঞানকেই প্রধান করে তুলতে পারেন, তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় পরিশুদ্ধ হয়ে উঠতে পারে। শিক্ষাব্যবস্থার মান নিয়ে এদেশ প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে প্রতিনিয়ত। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরবর্তী উচ্চতর ডিগ্রি হয়ে গেছে সহজলভ্য। গবেষকরা একটি দেশের সম্পদ। অথচ স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য তা করে ফেলেছে নিম্নমানের। পি.এইচ.ডি দিয়ে এখন আর বিশ্ববিদ্যালয় বা দেশের শিক্ষাব্যবস্থার অগ্রগতি পরিমাপ করা যায় না।

হুমায়ুন আজাদ বলেন, সহজলভ্য কোনো কিছুই সমাজ ও জাতির জন্য মঙ্গলজনক নয়। আর এতে দেশের শিক্ষার মান প্রশ্নবিদ্ধ হবে ও পরবর্তী প্রজন্ম অন্ধকারে পতিত হবে। হুমায়ুন আজাদ আরও বলেন, সৃজনশীল লেখকের বই পাঠককে আলোড়িত করে। কিন্তু যুগের প্রেক্ষাপটে বই লিখে লেখক নিজেদের স্বার্থ হাসিল করে। তাই সেই বই সমাজের বোঝাস্বরূপ। পাঠ্যপুস্তক থেকে শুরু কওে সকল বইয়ের সৃজনশীলতা আজ বিপর্যস্ত। সৃষ্টিশীল ও মননশীল লেখা ব্যতীত সমাজ হয়ে পড়ে অবরুদ্ধ। হুমায়ুন আজাদ বলেন, বই মানুষ, সমাজ, সভ্যতাকে সৃষ্টি করে ; আর অপবই বা অবই বিনষ্ট করে। বাংলা ভাষায় সহজবোধ্য ও পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ বই নেই । বাংলা একাডেমিকে গবেষণালব্ধ ও সবার জন্য বোধগম্য ব্যাকরণ রচনার দিক নির্দেশ দিয়েছেন।

হুমায়ুন আজাদের মতে সমাজের নীতিনির্ধারকদের এ ব্যাপারে আরও দায়িত্বশীল হতে হবে। তা না হলে শিক্ষাব্যবস্থা ধসে পড়বে আর দেশে বেকারদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়বে। শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। রাষ্ট্রযন্ত্র তাদেরকে সম্পদে পরিণত করতে পারছে না। চারিদিকে অমানবিকতার জয়ধ্বনি পরিলক্ষিত হয়। শিক্ষিতরা তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী সম্মান ও চাকুরী কোনটিই পাচ্ছে না।

হুমায়ুন আজাদের মতে শাসকগোষ্ঠী মেধা ও যোগ্যতা অনুযায়ী মানুষকে সম্মান না করতে পারলে অযাযিতভাবে পেশা পরিবর্তন হবে। ফলে রাষ্ট্রযন্ত্রের পচন ঘটবে। মেধাবীরা রাষ্ট্রের সম্পদ না হয়ে বোঝা হবে। শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে হুমায়ুন আজাদের চিন্তার প্রতিফলন তাঁর প্রবন্ধের বিষয়কে সমকালের পাশাপাশি আধুনিক যুগেও প্রাসঙ্গিক ও যৌক্তিক করেছে।

৬.

ষাটের দশকের অনেক প্রাবন্ধিকই সমকালীন প্রসঙ্গ নিয়ে লিখেছেন। যেমন- আবদুল হক (১৯১৮-১৯৯৭) তাঁর *ক্রান্তিকাল* (১৯৬২), *সাহিত্য ঐতিহ্য মূল্যবোধ* (১৯৬৮), *বাঙালী জাতীয়তাবাদ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ* (১৩৮০), *সাহিত্য ও স্বাধীনতা* (১৯৭৪), *ভাষা আন্দোলন: আদিপর্ব* (১৯৭৬) প্রভৃতি প্রবন্ধগ্রন্থে সমকালীন সাহিত্য, রাজনীতি, জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রসঙ্গ এসেছে। আহমদ শরীফ (১৯২১-১৯৯৯) তাঁর *বিচিত চিন্তা* (১৯৮৬), *স্বদেশ চিন্তা* (১৯৯৭), *বিশ শতকের বাঙালী* (১৯৯৮), *স্বদেশ অন্বেষা* (১৯৭০), *বাঙালির চিন্তা-চেতনার বিবর্তন ধারা* (১৯৮৭), *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* (১ম খণ্ড ১৯৭৮, ২য় খণ্ড ১৯৮৩) প্রভৃতি প্রবন্ধগ্রন্থে স্বদেশের প্রতি গভীর ভালোবাসা ও দায়বদ্ধতার পাশাপাশি সমকালীন বিভিন্ন প্রসঙ্গ প্রকাশিত হয়েছে। আহমদ ছফা (১৯৪৩-২০০১) *জাগ্রত বাংলাদেশ* (১৯৭১), *বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস* (১৯৭২), *বাংলাদেশের রাজনৈতিক জটিলতা* (১৯৯৭), *বাঙালি মুসলমানের মন* (১৯৮১), *সাম্প্রতিক বিবেচনা : বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস* (১৯৯৭), *বাঙালি জাতি ও বাংলাদেশ রাষ্ট্র* (২০০১) প্রভৃতি প্রবন্ধগ্রন্থে জাতিসত্তার পরিচয় নির্ধারণ প্রাধান্য পেয়েছে পাশাপাশি সমকালীন প্রসঙ্গও এসেছে। কিন্তু রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় না থেকেও দেশ ও মানবমুখী রাজনীতিচিন্তা হুমায়ুন আজাদকে বিশিষ্টতা দান করেছে। তাঁর প্রবন্ধে সমকাল প্রধান অনুষঙ্গ। তাঁর সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ক প্রবন্ধের ভাষা, বিষয়ের গভীরতা পাঠককে আলোড়িত করে। তিনি প্রচলিত প্রথানুরাগী চিন্তার ঘোরতর বিরোধী, অপ্রচল হলেও যা কিছু সাধারণ মানুষের জন্য কল্যাণকর, দেশ ও দেশের মানুষের ভবিষ্যত নির্মাণে সম্ভাবনাময় তাকেই তিনি সর্বতোভাবে সমর্থন করেছেন। হয়ত সেক্ষেত্রে তিনি সাম্যবাদী রাষ্ট্র-ধারণার খুব নিকটবর্তী ছিল কিন্তু মতবাদ বা তত্ত্বের চেয়ে তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল রাষ্ট্রের কল্যাণমুখী রূপ, দরিদ্র-অসহায় মানুষের প্রতি দায়িত্ববোধ। দুর্জন-দুর্বৃত্ত-

লুণ্ঠনকারী ধনিক-বণিক-ক্ষমতাবানদের জন্য তিনি তাঁর ভাষাকে গড়ে তুলেছিলেন শাণিতরূপে। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্য দূরীকরণের জন্যেই তিনি প্রবন্ধে তাঁর যুক্তিনিষ্ঠ বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। গতানুগতিক চিন্তাধারা অবলম্বন করে কিংবা সামাজিক প্রথার অনুবর্তী হয়ে তিনি সমাজ বিশ্লেষণ করেননি। তিনি ইতিহস ও ঐতিহ্য ধারণ করে স্বৈরাচার মুক্ত, দায়িত্বশীল শাসক, শাসন ও শোষণ মুক্ত রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রত্যাশা করেন তাঁর প্রবন্ধ বিশ্লেষণে এটি প্রতীয়মান হয়। দেশে ও বিদেশের সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞানসহ বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যয়ন করে এবং সমাজের অন্তর-বাহির সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ করে তিনি তাঁর চিন্তার জগতকে করেছিলেন সমৃদ্ধ। অধিকাংশ সাম্প্রতিক বিষয়াবলি তাঁর আলোচনায় হয়ে উঠেছে মন্তব্যধর্মী, প্রতিক্রিয়ামুখ্য। তবে জাতীয় স্বার্থ ও গণস্বার্থের সাথে একাত্মতা তাঁকে সীমিত সময়ের জন্য হলেও রাজনৈতিক বিশ্লেষকে পরিণত করে। একজন ঋজু-মননশীল-মুক্তচিন্তার বুদ্ধিজীবী হিসেবে তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। তবে রাষ্ট্র ও সমাজে আলোচিত-সমালোচিত বিষয়গুলিতে তাঁর অসঙ্কোচ প্রকাশ তাঁকে বিশেষভাবে আলোচিত অথবা বিতর্কিত করেছে বললে অত্যুক্তি হয় না। ফলে তাঁর প্রবন্ধের কিছু বক্তব্য মন্তব্যধর্মী মনে হলেও অধিকাংশই যুক্তিনিষ্ঠ, সময়োপযোগী ও প্রাসঙ্গিক। ষাটের দশকের কালপরিক্রমাকে তিনি সাহিত্যে যেভাবে এনেছেন তা যথেষ্ট প্রশংসার দাবিদার। তিনি নিঃসংকোচে তাঁর ধারণা ও মতামত ব্যক্ত করেছেন। ফলে একবিংশশতকেও তাঁর প্রবন্ধের বিষয় অনেক প্রাসঙ্গিক ও যুক্তিযুক্ত এবং তাঁকে স্বতন্ত্র করেছে।

তথ্যসূত্র

আলী, মোহাম্মদ (২০১৮), *হুমায়ুন আজাদ*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি।
আজাদ, হুমায়ুন (২০০৬), *একুশ আমাদের অঘোষিত স্বাধীনতা দিবস*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।
আজাদ, হুমায়ুন (২০১৪), *ধর্মানুভূতির উপকথা ও অন্যান্য*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।
আজাদ, হুমায়ুন (২০০৮), *রাজনৈতিক প্রবন্ধসমগ্র*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।
আজাদ, হুমায়ুন (২০০৩), *আমরা কি এই বাঙলাদেশ চেয়েছিলাম?* ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।
আজাদ, হুমায়ুন (১৯৯২), *জলপাই রঙের অন্ধকার*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।
আজাদ, হুমায়ুন (১৯৯২), *মাতাল তরণী*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।
আজাদ, হুমায়ুন (২০১৫), *নারী*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।
আজাদ, হুমায়ুন (২০০৬), *আমাদের বইমেলা*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।
আজাদ, হুমায়ুন (২০০৮), *প্রবন্ধসমগ্র*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।
আজাদ, হুমায়ুন (২০১৪), *ভাষা-আন্দোলন: সাহিত্যিক পটভূমি*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।
আজাদ, হুমায়ুন (১৯৯২), *প্রতিক্রিয়াশীলতার দীর্ঘ ছায়ার নিচে*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।
আজাদ, হুমায়ুন (১৯৯২), *আধার আধেয়*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯২।
আজাদ, হুমায়ুন (২০১৪), *নির্বাচিত প্রবন্ধ*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।
আজাদ, হুমায়ুন (১৯৯৩), *সীমাবদ্ধতার সূত্র*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।